শিক্ষা : অন্তর্নিহিত সম্পদ

একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা নিয়ে ইউনেস্কোতে পেশ করা জাক দ্যলরের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক কমিশনের প্রতিবেদন

—প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা : অন্তর্নিহিত সম্পদ

একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা নিয়ে
ইউনেস্কোতে পেশ করা জাক দ্যলরের সভাপতিত্বে
আন্তর্জাতিক কমিশনের প্রতিবেদন।

—প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

কমিশনের সদস্যমণ্ডলী

জাক দ্যলর, সভাপতি
ইনাম অল্ মুফতি
ইসাও আমাগি
রবার্তো কার্নেইরো
ফে চুংগ
ব্রনিস্ল গেরেমেক্
উইলিয়াম গরহ্যাম
আলেকসান্দ্রা কর্নহাউসের
মাইকেল ম্যানলে
মারিসেলা প্যাড্রন কুয়েরো
মেরী আঞ্জেলিক্ সাভানে
করন সিং
রডল্ফো স্ট্যাভেনহ্যাগেন
মিয়ং ওন্ সুর
ঝাও নান্‌ঝাও

অনুবাদক : ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
গণপ্রকাশনী, ৯ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোন : ২১৯-০২৫৫

অনুবাদকের কথা

একুশ শতকের একেবারে দোরগোড়ায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বে এক বিশাল সংখ্যক জনসাধারণ আজও অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে আছে। কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক হলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাগুলিকে অবহেলা করা যায় না। এই অবস্থায় শিক্ষার প্রসার ঘটানো আজকে একটি আন্তর্জাতিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে ইউনেস্কো। এই সংস্থার তৎপরতায় একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল একুশ শতকের উপযোগী শিক্ষার রূপরেখা রচনা করা। কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন জাক দ্যলর, যিনি এক সময় ফ্রান্সের অর্থনীতি ও রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া জর্ডন, জাপান, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া, জামাইকা, ভেনিজুয়েলা, সেনেগাল, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড, জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য ছিলেন।

এই কমিশন শিক্ষার নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনা করার পর যে মূল প্রতিবেদনটি ইউনেস্কোর কাছে পেশ করেছিল তার আয়তন কিঞ্চিৎ বৃহৎ। এর জন্যে ইউনেস্কো ঐ প্রতিবেদনের একটি সারসংক্ষেপও প্রকাশ করে, যেটি মূলতঃ কমিশনের সভাপতি জাক দ্যলরেরই লেখা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ মূল প্রতিবেদন এবং সংক্ষিপ্তসার দুটিই প্রকাশ করার কাজে বৃত-হয়েছে। কেননা এই সংস্থা মনে করে যে আন্তর্জাতিক কমিশনের ঐ প্রতিবেদনের বিষয়াবলী পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসারে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তা হিসাবে আমি নিজেই এই অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছি। উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে প্রতিবেদনটিকে বারবার করে পড়া। আন্তর্জাতিক কমিশনের এই প্রতিবেদনটি অনুবাদ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন রাজ্যের মাননীয় স্কুল শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত কান্তি বিশ্বাস। এবং তিনিই নিজের সংগ্রহ থেকে এই প্রতিবেদনের জেরক্স কপি আমাকে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমি নানাভাবে যাঁদের কাছে সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন শ্রী বিশ্বজিত দাস, শ্রী অগ্নিবীণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী আসগার আলি, শ্রী গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি। এদের সকলকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য শ্রী ফাল্গুনী চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নানা ব্যস্ততা এবং পরিভাষাজনিত সমস্যার কারণে অনুবাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রয়ে গেছে তার জন্যে আমিই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। তবে আশা করি সুধীপাঠকবৃন্দের উপদেশ আমার ভবিষ্যতের পাথেয় হবে।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা,

৮ই এপ্রিল, ১৯৯৮

বিষয়াবলী

জাক দ্যলর

শিক্ষা : প্রয়োজনীয় স্বপ্নরাষ্ট্র

ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়ের আদর্শগুলি অর্জন করার জন্য শিক্ষাকেই মানুষ অপরিহার্য বলে মনে করে। কাজের শেষে কমিশন তার নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। কমিশন মনে করে না যে 'শিক্ষা' অলৌকিক নিরাময় পদ্ধতি বা ঐন্দ্রজালিক সূত্র যার সাহায্যে জগতের এমন কোন দরজা খুলে যাবে যেখানে আদর্শগুলি অর্জন করা যাবে। কিন্তু নিবিড় ও সমন্বয়মূলক মানবোন্নয়ন এবং দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সামাজিক ন্যায় ও যুদ্ধের বাতাবরণ দূর করার উদ্দেশ্যে 'শিক্ষাকে' প্রধান উপায় বলে কমিশন মনে করে।

যে সময়ে আর্থিক কারণের জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলি প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত এবং অবহেলিত হচ্ছে, সে সময়ে বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং প্রস্তাবনার মাধ্যমে তার এই বিশ্বাসের কথা কমিশন আরও বেশি করে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায়।

যারা আজকের প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে ভবিষ্যতের ভার নেবে প্রধানত সেই সব শিশু এবং যুবসমাজের কথাই কমিশন বেশি করে চিন্তা করছে। কেননা প্রাপ্তবয়স্করা প্রধানত তাদের নিজেদের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। শিশু এবং যুবসমাজকে ভালবাসাও শিক্ষার একটা প্রধান কাজ। সমাজে এদের স্বাগত জানাতে হবে।

শিক্ষার জগৎ, পারিবারিক জগৎ এবং জাতীয় স্তরে এদের প্রাপ্য স্থান দিতে হবে। এই কর্তব্যের কথা সবসময় মনে রাখতে হবে, যাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মনোনিবেশের সময় এই ব্যাপারটিই প্রধান গুরুত্ব পায়। কবির ভাষায় : 'শিশুই মানুষের জনক'।

এই শতকের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এই উন্নতি যে কোন কারণেই হোক সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া যায় নি। নতুন শতকের গোড়ায় আমরা আশা ও উদ্বেগের মধ্যে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটি দায়িত্বশীল মানুষেরই এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সংস্থানের বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত।

কমিশন মনে করে যে শিক্ষা, জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও এর প্রধান উদ্দেশ্য হল গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং জাতির সঙ্গে জাতির সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

কমিশনের সদস্যরা তাঁদের মতামত জ্ঞাপনের সময়ে এই ধারণাটি দৃঢ়ভাবে ধার্য করেছেন। এক্ষেত্রে ইউনেস্কোর কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথাও তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন। ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হল এমন একটি সমাজ তৈরী করা যা আজকের তুলনায় অধিকতর সুন্দর। যেখানে লোকে পুরুষ-নারীর অধিকারগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেখানে পারস্পরিক সম্প্রীতি রয়েছে ও জ্ঞানের প্রসার মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির পরিবর্তে মানবোন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলি মাথায় রেখে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান বার করার অসাধ্য ভার কমিশনের ওপর বর্তেছে। যাই হোক বিশ্বজনীন ভবিষ্যৎ সমাজে সকলের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের উপযোগী সমাধান সূত্র তৈরী করার জন্য কমিশন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ

গত পঁচিশ বছরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে। নতুন নতুন উদ্ভাবনার সাহায্যে অনেক দেশই অনুন্নত অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবন ধারণের মান বাড়ছে। যদিও এই উত্তরণের হার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। তা সত্ত্বেও বর্তমান অসন্তোষের বাতাবরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে উন্মেষিত প্রত্যাশাপূর্ণ আবহাওয়ার ঠিক বিপরীত।

কাজেই এটা বলা যায় যে আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতি মোহভঙ্গকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ক্রমবর্ধমান বেকারি এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের মধ্যেই তা প্রতিভাত। সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের আঞ্চলিক তারতম্যে উন্নয়নের সুফলের অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে।[১] প্রাকৃতিক পরিবেশের সংকটগুলি সম্পর্কে যখন

---

(১) ইউ এন সি টি, ডি-র সমীক্ষা অনুযায়ী ন্যূনতম উন্নত দেশগুলির (৫৬ কোটি অধিবাসী সম্বলিত) গড় আয় নিম্নমুখী। সম্ভাব্য হিসেবে অনুযায়ী সংখ্যাটি হল জনপ্রতি বছরে ৩০০ ডলার, সেখানে উন্নয়নশীল দেশে তা জনপ্রতি ৯০৬ ডলার এবং শিল্পোন্নত দেশে জনপ্রতি ২১,৫৯৮ ডলার।

মানবজাতি ক্রমবর্ধমানভাবে সচেতন হয়ে উঠছে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা বড় ধরনের শিল্পদুর্ঘটনা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাবধানবাণী শোনা যাচ্ছে তখনও কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান ঠিকভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। যদিও এ সম্পর্কে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (যথা পরিবেশ এবং উন্নয়ন নিয়ে ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা)। এটাই সত্য যে আগাগোড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই আর সমানুপাতিক বস্তুগত উন্নয়নের একমাত্র উপায় বলে দেখা চলবে না। মানুষের অবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন রেখে এবং দেশগুলির গুণমান বজায় রেখে তা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

যাই হোক আমরা কার্যকরী উন্নয়নের উপায় ও লক্ষ্যগুলি আয়ত্ত করেছি এবং এক নতুন আকারের আন্তজাতিক সহযোগিতার সংশ্লেষ ঘটাতে পেরেছি। এই বিষয়টিই আগামী শতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক চাহিদার রূপ নেবে।

তাই বলে অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তিগুলিকে উপেক্ষা করা উন্নয়নশীল দেশগুলির উচিত নয়। বিশেষত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা যখন বর্তমান এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অভিযোজনের আধুনিকীকরণ একান্ত জরুরী বিষয়।

যারা মনে করতেন যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষে একটি সুন্দরতর এবং শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরী হয়ে উঠবে তাদের হতাশ হবার আরও একটি কারণ আছে। 'ইতিহাস দুঃখদায়ক', শুধু এটার পুনরাবৃত্তি করে নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়া যথেষ্ট নয়। কেননা একথা সকলেই জানে অথবা জানা উচিত যে গত বিশ্বযুদ্ধে যদিও ৫০ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলেন কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত (বার্লিন প্রাচীর ভাঙার আগে ও পরে) প্রায় ২০ কোটি মানুষ কমবেশী ১৫০টি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এগুলি নতুন অথবা পুরনো ঝুঁকি কিনা সেটা বড় কথা নয়। বিভিন্ন দেশ এবং জাতির মধ্যে টানা উত্তেজনা প্রথমে ধিকি ধিকি জ্বলে এবং তার পর এক সময়ে হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অতএব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবিচারের ফলে মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরতা এবং বিভিন্ন সমস্যার ভুবনীকরণের প্রাক্কালে সিদ্ধান্ত

গ্রহণকারীদের এই সব ঝুঁকিগুলির মূল্যায়ন ও নিবারণ করা উচিত।

কিন্তু আমরা "বিশ্বজনীন পল্লী"-তে একসঙ্গে কীভাবে বাস করতে শিখব? যদিনা আমরা বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে যে সব গোষ্ঠীতে বাস করি—যথা জাতি, ধর্ম, নগর, গ্রাম, পরিপার্শ্ব—সেগুলিতে মিলেমিশে না থাকতে পারি। আমরা কি সমাজ জীবনে কোন অবদান রাখতে পারি এবং রাখতে চাই? এটাই হল গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। এটা মনে রাখতে হবে যে অংশগ্রহণের ইচ্ছা আসা উচিত দায়িত্ববোধ থেকে। কিন্তু যদিও অতীতে স্বৈরাচারী শাসকদের শাসিত বহু ভূখণ্ড গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে এসেছে এবং যে সব দেশে বহুদিন ধরে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রয়েছে সে সব দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আবার চিড় ধরেছে। সেই জন্য, সব কিছু নতুন করে শুরু করতে হবে এবং বারবার নবীকরণ করতে হবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে এই সমস্ত সমস্যাগুলি যথোপযুক্ত গুরুত্ব না পাওয়া কি সম্ভব? কমিশন কী করে ব্যর্থ হতে পারে সেই সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে, যাতে কিনা শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলি যথোপযুক্ত মানবিক উন্নয়ন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ব্যবহারিক গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন পৃথিবী গঠন করতে পারে।

যে সমস্ত অন্তরীণ উত্তেজনাকে জয় করতে হবে

এর জন্য আমাদের প্রধানত যে সব অন্তরীণ উত্তেজনার সম্মুখীন হতে হবে বা সমাধান করতে হবে সেগুলি নতুন নয়, বরং একবিংশ শতকের কেন্দ্রীয় সমস্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই সমস্যাগুলি যথাক্রমে—

● আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিকতার অন্তর্বর্তী চাপা উত্তেজনা: নিজস্ব মূল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এবং নিজের জাতি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং সেখানেই শিকড় বজায় রেখে মানুষের ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক নাগরিক হয়ে ওঠা প্রয়োজন।

● ব্যক্তি এবং সর্বজনীনের অন্তর্বর্তী চাপা উত্তেজনা: যদিও সংস্কৃতি নিয়মিতভাবে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে কিন্তু তা এখনও আংশিকভাবে হয়েছে। আমরা বিশ্বজনীনতার প্রতিজ্ঞা অথবা ঝুঁকিকে অবহেলা করতে পারি না। ঝুঁকিগুলির মধ্যে অন্যতম হল

মানুষের নিজস্ব চরিত্রের কথা ভুলে যাওয়া। মানুষকে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে এবং নিজের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে স্ব ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে। আমরা যদি যত্নবান না হই তাহলে এই প্রক্রিয়া সমসাময়িক উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্বারা বিঘ্নিত হবে।

● ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার অন্তর্বর্তী চাপা উত্তেজনা যা এই সমস্যারই অংশ: অতীতকে অস্বীকার না করে কীভাবে পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে একজন খাপ খাওয়াতে পারে। অন্যদের মুক্ত উন্নতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে অঙ্গীভূত করে কীভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা যায়, এই মানসিকতার মধ্যে দিয়েই তথ্য যুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।

● দীর্ঘস্থায়ী এবং স্বল্পস্থায়ী বিবেচনাগুলির অন্তর্বর্তী চাপা উত্তেজনা: এ ধরনের উত্তেজনা সব সময়ই আছে। কিন্তু বর্তমান যুগে তা ঘনীভূত হয়েছে তাৎক্ষণিক বিবেচনার আধিপত্যের জন্য। কারণ ক্ষণজন্মা তথ্য এবং আবেগের অপ্রতুলতা সবসময়ই প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলিকে পাদপ্রদীপের আলোয় রেখে দেয়। ত্বরিৎ উত্তর এবং তৈরী সমাধানের ব্যাপারে জনমত উদ্‌গ্রীব। যদিও অনেক সমস্যা আছে যেগুলির জন্য দরকার ধৈর্য, সুশৃঙ্খল এবং আলোচনাভিত্তিক সংস্কারের কৌশল। এই সমস্ত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কযুক্ত।

● একদিকে প্রতিযোগিতা অন্যদিকে সুযোগের সমতার অন্তর্বর্তী চাপা উত্তেজনা: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শতাব্দীর শুরু থেকেই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিনির্ধারকরা বারবার এ বিষয়টির সম্মুখীন হচ্ছেন। কোন কোন সময়ে কিছু কিছু সমাধান প্রস্তাবিত হলেও কোনটিই সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। আজ কমিশন এই দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছে যে প্রতিযোগিতার চাপের ফলে কর্তৃত্বে থাকা বহু লোকই তাদের উদ্দেশ্যকেই হারিয়ে ফেলেছেন। উদ্দেশ্যটি হল, প্রত্যেক মানুষকেই সবরকম সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান যোগান। এই কারণে আমরা এই প্রতিবেদনের বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণাটির পুনর্বিবেচনা এবং নবীকরণের ব্যাপারটি ধর্তব্যের মধ্যে এনে তিনটি ধারণার সমন্বয়সাধন করেছি। যেগুলি হল: প্রতিযোগিতা যা উদ্দীপনা দেয়; সহযোগিতা যা শক্তি জোগায় এবং ঐক্য যা একত্রিত করে।

● জ্ঞানের অগ্রগতি এবং মানবজাতির সেই জ্ঞান সংশ্লেষ করার ক্ষমতা অন্তর্বর্তী চাপা উত্তেজনা: পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে কিছু নতুন বিষয় সংযোগ করার প্রলোভন কমিশন সামলাতে পারে নি। যেমন স্বশিক্ষা, শারীরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার পন্থা অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও ভালোভাবে বোঝা এবং রক্ষা করার উপায়। যেহেতু ইতিমধ্যে পাঠ্যসূচীর ভার বাড়ছে, যে কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন সংস্কার পদ্ধতির মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ থাকা দরকার যাতে সবসময়ে বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এবং নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে উন্নত করার শিক্ষা দান করার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকে। সব শেষে, আর একটি চিরকালীন উপাদান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক এবং জাগতিকের অন্তর্বর্তী চাপা উত্তেজনা: অনেক সময় না বুঝে (বহু সময় স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করে), 'নৈতিক' আদর্শ ও মূল্য খোঁজার একটি প্রবণতা আছে। কাজেই, প্রত্যেককে তাদের ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে বহুত্ববাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য মন এবং মননের উন্নতি করতে এবং কিছু পরিমাণে নিজেদের অতিক্রম করার জন্য উৎসাহিত করা শিক্ষার একটি মহৎ কর্তব্য। কমিশন এই কথা বললে অত্যুক্ত হবে না যে মানবিকতার অস্তিত্ব রক্ষা এর ওপরেই নির্ভর করে।

আমাদের সর্বজনীন ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ

একদিকে বিশ্বায়ন, যার লক্ষণগুলি সহজেই দৃশ্যমান এবং যা বহুসময়েই মেনে নিতে আমরা বাধ্য, আর অন্যদিকে নিজেদের মূল্যের সন্ধান ও নির্দেশ এবং তার সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার ইচ্ছা — এই দুইয়ের টানাটানিতে আজকের মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন।

আগের তুলনায় আরও বেশী মাত্রায় শিক্ষা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে কারণ একটি বিশ্বসমাজ ভূমিষ্ঠ হবার জন্য ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত উভয় প্রকার উন্নয়নেরই মূলে রয়েছে শিক্ষা তার লক্ষ্য হল ব্যতিক্রমহীন আমাদের প্রত্যেককে সক্ষম করা, নিজেদের সমগ্র প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফূরণ ঘটাতে এবং নিজেদের সৃজনশীল ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করা যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের

জীবন সম্পর্কে দায়িত্ববান হতে এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারি।

এই লক্ষ্যগুলি অন্য সব কিছুকে অতিক্রম করে। যদিও এটি সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। এই লক্ষ্য অর্জন আরও নীতিপরায়ণ এবং অধিকতর বাসযোগ্য একটি জগতের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় উপায়। কমিশন এই ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে চায় এমন একটি সময় যখন শিক্ষার দ্বারা উন্মেষিত সুযোগগুলির সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান।

এটা সত্যি যে আরও অনেক সমস্যার সমাধান করতে হবে। এবং আমরা সে প্রসঙ্গে ফিরে আসব। কিন্তু এই প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে এমন একটি সময়ে যখন যুদ্ধ, অপরাধমূলক কাজকর্ম এবং অনুন্নতিজনিত দুর্ভাগ্যের কারণে মানুষ একই পথে এগিয়ে যাওয়া অথবা হাল ছেড়ে দেওয়া এই দুইয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। আসুন আমরা মানুষকে অন্য একটি পথ দেখাই।

সুতরাং শিক্ষার নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলির ওপর নতুনভাবে অগ্রাধিকার দেবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাতে প্রত্যেকেই অন্যের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট একতার দিকে পৃথিবীর অগ্রগতিকে বুঝতে পারে। কিন্তু এই প্রণালী শুরু হওয়া উইচত আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে যার ক্রমাঙ্কগুলি হল জ্ঞান, ধ্যান এবং আত্মসমালোচনার অভ্যাস।

এই বার্তাই শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার প্রেরণা হওয়া উচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হবে আরও ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী আন্তর্জাতিক সহযোগিতার রীতি, যে বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট স্থানের আওতায় পড়ে—তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনে আত্মজ্ঞান এবং পরিবেশের সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে হোক, অথবা একটি ব্যক্তিকে তার পরিবারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করার ব্যাপারে কিংবা নাগরিক অথবা সমাজে উৎপাদনশীল সদস্য হিসাবে কাজ করার উপযুক্ত হওয়ার জন্যও হতে পারে। এগুলি দেখায় যে স্বাস্থ্য, পরিবেশ থেকে উৎপাদিত পণ্য, বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবন, জ্ঞান নির্ভর সমাজে উত্তরণ, জ্ঞান আহরণের দেশজ পদ্ধতি এই সব দেশে বর্তমান। এই কারণেই

অল্পবয়সে বিজ্ঞান প্রযুক্তির এবং তাদের প্রয়োগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও মানবিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ও প্রগতিতে অঙ্গীভূত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এখানেও ন্যায়নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিকে উপেক্ষা করা চলবে না।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবদান সম্পর্কেও কমিশন সচেতন। অনেক সময়েই বেকারীর জন্য শুধু শিক্ষাপ্রণালীকে দোষ দেওয়া হয়। এই পর্যবেক্ষণ কেবলমাত্র আংশিক সত্য। পুরোপুরি কর্মনিযুক্তি এবং অনুন্নত দেশগুলির উত্তরণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শর্তগুলিকে উপেক্ষা করা চলবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন এটা মনে করে যে শ্রমবাজারে চাহিদা ও জোগানের বৈষম্যজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে সক্ষম উত্তর আসতে পারে আরও নমনীয় একটি প্রণালী থেকে। যা আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠক্রম অনুমোদন করে এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সেতুনির্মাণ অথবা কর্মজীবন ও যোগসূত্র তৈরী করে। এ ধরনের নমনীয়তা বিদ্যালয়ে অকৃতকার্যতা এবং মানবশক্তির অপচয় হ্রাস করে।

এ সমস্ত উন্নতি কাম্য এবং সম্ভব হলেও, তা বৌদ্ধিক প্রবর্তন এবং প্রত্যেক দেশের চরিত্র অনুযায়ী ক্রমিকউন্নতির একটি রূপরেখা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের অগ্রগমনগুলির কথা এবং পণ্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং অন্যান্য স্পর্শানুতীত বিষয়গুলির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে আমাদের কাজের জায়গা এবং ভবিষ্যৎ সমাজে তার পরিবর্তনশীল অবস্থার কথা ভাবতে হবে। আগামীদিনের সমাজ সৃষ্টির জন্য বেকারী বৃদ্ধি, সামাজিক বহিষ্কার অথবা উন্নয়নে বৈষম্য রোধ করতে কল্পনাকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সম্মুখে থাকতে হবে।

এ সব কারণে আমাদের মনে হয় জীবনব্যাপী শিক্ষা, নমনীয়তা, বৈচিত্র্য এবং প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রাপ্যতার বিষয়টি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা উচিত। জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণাটি পুনরায় চিন্তা ও প্রসার করা প্রয়োজন। কাজের ধারার পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া শুধু নয়, উপরন্তু যাতে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবজাতির সার্বিক উন্নতি হয় এবং তাদের জ্ঞান, প্রবণতা এবং কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে এই লক্ষ্যেই জীবনব্যাপী শিক্ষাকে পরিচালিত করা দরকার। মানুষকে কেবলমাত্র কাজের ধারার পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত করাই নয় উপরন্তু

মানুষকে সচেতন করা এবং সামাজিক ও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করাও তার লক্ষ্য। এই ধরনের শিক্ষা মানুষকে নিজের এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করতে সাহায্য করে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে সামাজিক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত সমাজের দিকে এগোবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিশন আলোচনা করছে। সত্যি হল এই যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান আহরণ এবং কাজ করার সুযোগ আছে। কাজেই, প্রশ্নটির এই দিকটিকে এবং আধুনিক মাধ্যমগুলির শিক্ষাসংক্রান্ত উপযোগিতা সাংস্কৃতিক এবং অবসরকালীন কাজগুলিকে অধিক গুরুত্ব দেবার প্রবণতা রয়েছে। এবং তা আছে কতগুলি প্রাথমিক সত্যকে উপেক্ষা করেও: যদিও মানুষের উচিত শিক্ষা এবং আত্মোন্নতির সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করা। কিন্তু তারা এসব সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে না যদি না তারা ভালরকম প্রাথমিক শিক্ষা পায়। তা সত্ত্বেও এটা লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে বিদ্যালয়গুলি শেখার আগ্রহ এবং আনন্দ যোগাতে পারে, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা জাগাতে পারে। কিছুলোক এমনকি এমন সমাজের কথা কল্পনা করতে পারে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি একাধারে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

এসবের জন্য প্রথাগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কারণ এই শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে একজন অনেক ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, যা অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে তৈরী হয়ে ওঠে, তার কোন বিকল্প নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে উচ্চমার্গীয় চিন্তাবিদ্‌রা, যাঁরা শিক্ষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন, তাঁরা অনেক সময়েই নানা তর্কবিতর্কের অবতারণা করেছেন। মানুষকে তার নিজের সম্পর্কে, প্রকৃতি সম্পর্কে এবং তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি ও আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত করা শিক্ষকের দায়িত্ব।

আজীবন জ্ঞানার্জন: সমাজের হৃদস্পন্দন

কাজেই সারাজীবন ধরে শিক্ষা নেওয়াই হল একবিংশ শতকের অন্যতম চাবিকাঠি। প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধারাবাহিকতার প্রচলিত ভেদটিকে তা অতিক্রম

করে। এই জ্ঞানার্জন দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের প্রশ্নগুলিকে মোকাবিলা করতে পারে। এটা কোন নতুন অন্তর্দৃষ্টি নয়, কারণ আগের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলিও ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে নতুন নতুন অবস্থার সম্মুখীন হবার ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। ঐ প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় এবং তা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। এই প্রয়োজনকে মেটানোর একমাত্র উপায় হল প্রত্যেক মানুষেরই কীভাবে জ্ঞানার্জন করা যায় তার শিক্ষা নেওয়া। কিন্তু এরও অতিরিক্ত একটি প্রয়োজন আছে। গতানুগতিক জীবনযাত্রায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের জন্য মানুষ এবং সারা বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের পূর্ণতর ধারণার জন্য দরকার পারস্পরিক বোঝাপড়া, শান্তিপূর্ণ আদানপ্রদান এবং অবশ্যই সমন্বয়। আজকে আমাদের পৃথিবীতে ঠিক এই বিষয়গুলিই অভাব। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কমিশন যে চারটি প্রধান স্তম্ভকে শিক্ষার ভিত বলে বর্ণনা করেছে এবং তার একটির ওপর জোর দিতে চায় তা হল, সকলে মিলে বাঁচতে শেখা। এর জন্য অন্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে উপলব্ধি করে এক সঙ্গে বাঁচতে শেখা এবং এই ভিত্তিতে একটা নতুন প্রেরণা তৈরী করা যা আমাদের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকার করে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের ঝুঁকি এবং সমস্যাগুলির সর্বজনীন বিশ্লেষণ করে মানুষকে সর্বজনীন কর্মকাণ্ড রূপায়ণ করতে অথবা অনিবার্য সংঘাতগুলিকে বিচক্ষণ, শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে সাহায্য করে। এটাকে 'কল্পলোক' বলতে পারেন। কিন্তু এটা একটি প্রয়োজনীয় 'কল্পলোক'। বস্তুত এটি অত্যাবশ্যক কল্পলোক যার সাহায্যে আমরা হতাশা এবং পরনিন্দাকে অতিক্রম করতে পারি। যদিও কমিশন এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবে যা একটি নতুন প্রেরণা তৈরী করবে কিন্তু একই সাথে শিক্ষার অন্য তিনটি স্তম্ভকেও মূল্যবান বলে মনে করবে। যার মূল কথা হল একসাথে বাঁচতে শেখা।

এগুলির প্রথমটি হল জানতে শেখা। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং নতুন ধরনের আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত দ্রুত পরিবর্তনগুলির কথা মাথায় রাখলে, সুপরিসর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কিছু নির্বাচিত বিষয়ের ওপর গভীর অনুধাবনকে গুরুত্ব দিতে হবে। বলতে গেলে, এই রকম একটা সাধারণ পটভূমিকা সারাজীবন ধরে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করবে এবং ঐ বিষয়ে জনগণের রুচি তৈরী করবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একটি বিষয়ের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না যা হল করতে

শেখা। এটি শিক্ষার আর একটি স্তম্ভ। একটা নির্দিষ্ট কর্মশিক্ষা যা সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে এমন একটি ক্ষমতা তৈরী করে যার ফলে অদৃষ্টপূর্ব সমস্যার মোকাবিলায় মানুষ দায়বদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। অনেক সময়েই ঐ দক্ষতা আরও বেশী করে লাভ করা যায় যদি শিক্ষার্থীরা শিক্ষণকালের মধ্যেই কর্মঅভিজ্ঞতা অথবা সমাজসেবায় সামিল হয়ে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

শেষতম স্তম্ভটি হল হতে শেখা। এটি শেষস্তম্ভ হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো প্রকাশিত এড্গার ফাউরের "হতে শেখা: বর্তমান এবং আগামী দিনের শিক্ষাজগৎ" শীর্ষক প্রতিবেদনে এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রতিবেদনের সুপারিশগুলি এখনও খুব প্রাসঙ্গিক। কারণ একবিংশ শতাব্দীতে সর্বজনীন লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই আরও স্বাধীনভাবে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এবং জোরালো ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধের সঙ্গে কাজ করা দরকার। আমাদের প্রতিবেদন অতিরিক্ত কিছু মাত্রা যোগ করেছে: যা হল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে গুপ্তধনের মত যে প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে তাকে খুঁজে বার করা দরকার। এর কয়েকটি হল স্মৃতিশক্তি, যুক্তিবাদী ক্ষমতা, কল্পনা, শারীরিক ক্ষমতা, সৌন্দর্যবোধ, অন্যদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ক্ষমতা ও একজন দলনেতার স্বাভাবিক আকর্ষণ—যা আবার আত্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

কমিশন পরোক্ষভাবে আর একটি কল্পলোকের ধারণা পোষণ করে: গ্রহণ, নবীকরণ এবং জ্ঞানের প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে একটি শিক্ষাগ্রহণকারী সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই তিনটি বিষয়কে শিক্ষা পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। "তথ্য সমাজ" উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের এবং ঘটনা জানার সুযোগ বাড়ানোর জন্য শিক্ষার উচিত সকলকে তথ্য সংগ্রহ, নির্বাচন, সাজানো এবং পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যবহারে সক্ষম করা।

একদিকে যেমন শিক্ষার উচিত সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়া কিন্তু অন্যদিকেতা যেন কোনভাবেই মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল, ভিত্তি এবং সুফলগুলিকে উপেক্ষা না করে তাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

ক্রমাগত আরও বেশী করে গুণগত শিক্ষার চাহিদার মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলি কী করে উচ্চ শিক্ষার মান এবং সমতার যুগ্ম লক্ষ্য অর্জন করবে? পাঠক্রম,

শিক্ষাপদ্ধতি এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উপযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনা কমিশন এই প্রশ্নগুলির জবাব দিয়েছে।

শিক্ষার পর্যায়ক্রম ও সেতুবন্ধন: একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা সংক্রান্ত সুপারিশগুলির প্রতি আলোকপাত করে কমিশন এই ধারণা দিতে চায়নি যে এরকম একটি গুণগত আকস্মিক পরিবর্তনের দ্বারা কেউ শিক্ষার বিভিন্ন ধাপগুলি এড়িয়ে যেতে পারে। বরং ইউনেস্কোর কতগুলি সাধারণ নীতি—যেমন বুনিয়াদি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মাধ্যমিক শিক্ষার ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন এবং উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে গণউচ্চশিক্ষার ফলাফলগুলিকে পরীক্ষা করা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

খুব সহজভাবে বলা যায় যে জীবনব্যাপী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরকে অতিক্রম করা এবং শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যেকটি পথকে উন্মুক্ত করে শিক্ষার নানা স্তরকে বিন্যস্ত করতে সাহায্য করে। জীবনব্যাপী শিক্ষার সাহায্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন—যা কিনা প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরনকে বাধা দেয় এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত নির্বাচনকে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়টি ১৯৯০ সালে তাইল্যাণ্ডের জম্‌তিয়েনে অনুষ্ঠিত সকলের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলনে গৃহীত বুনিয়াদি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, তাদের ক্ষমতার পূর্ণবিকাশ ঘটাতে, সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে এবং কাজ করতে, উন্নয়নে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে, তাদের জীবনের গুণগত উন্নয়নে, অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং শিক্ষণ বজায় রাখতে আবশ্যিক শিক্ষণ প্রণালী (যেমন সাক্ষরতা, মৌখিক অভিব্যক্তি, সংখ্যাবৃদ্ধি ও সমাধান) এবং মূল শিক্ষণ বিষয় (যেমন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং আচরণ) উভয়ের প্রয়োজন আছে। (সকলের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী ঘোষণা, (বিধিনির্দেশ-১, অনুচ্ছেদ-১)।

অবশ্যই এটি একটি সুন্দর তালিকা। কিন্তু এমন নয় যে এটি পাঠক্রমের ভারসংক্রান্ত ইঙ্গিত দেয়। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, শিশুর স্থানীয় পরিবেশে লভ্য শিক্ষা

এবং আধুনিক মাধ্যমগুলির ফলপ্রসূ ব্যবহার (যেখানে আছে) সংযুক্ত প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত এবং বৌদ্ধিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। থ্রী আর অর্থাৎ পঠন, লিখন এবং গণিত বিদ্যাকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে গতানুগতিক শিক্ষণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষণ প্রণালীর সংমিশ্রণে শিশুরা ন্যায়নীতি ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অর্থনীতি ও সামাজিক শিক্ষার এই তিনটি মাত্রা সম্পর্কে অবহিত হবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, শিক্ষা একটি সামাজিক অভিজ্ঞতাও বটে, যার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারে, পরস্পরের দক্ষতা বাড়াতে পারে এবং সাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই অভিজ্ঞতা শুরু হওয়া উচিত প্রথম শৈশব থেকে এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সবসময়েই তা পরিবার ও স্থানীয় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত। এই পর্যায়ে দুটি লক্ষণীয় বিষয়ের কথা উচিত বলে কমিশন মনে করে।

বুনিয়াদি শিক্ষা সারা বিশ্বে ৯০ কোটি নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে, ১৩ কোটি বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশুদের মধ্যে ও ১০ কোটির অধিক বিদ্যালয় ত্যাগ করা শিশুদের মধ্যে সম্প্রসারিত করা উচিত।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ হিসাবে প্রযুক্তি সংক্রান্ত সহযোগিতা এবং অংশিদারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই বিরাট কর্মকাণ্ড একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

শিল্পোন্নত দেশগুলি সহ অন্যান্য সমস্ত দেশেই বুনিয়াদি শিক্ষা একটি আলোচ্য বিষয়। প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সারাজীবনব্যাপী শিক্ষার ইচ্ছা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এটা আমাদের কৈশোরের এবং প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা এবং জীবিকা অথবা উচ্চশিক্ষার সংস্কার সংক্রান্ত সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনায় অপ্রীতিকর ভাবমূর্তি নিয়ে থাকে। তারা একদিকে যেমন প্রচুর সমালোচনার লক্ষ্য তেমনি প্রচুর হতাশার কারণ।

হতাশার উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে নানাধরনের বর্ধিত এবং ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন। যার ফল হল নথীভুক্তকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পাঠক্রম ভার—

যা গণশিক্ষার পরিচিত সমস্যা এবং যা অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অথবা সংগঠনিক স্তরে সহজে সমাধান করতে পারে না। সেই সঙ্গে যারা যথেষ্ট সুযোগ না পেয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে তাদের দুর্দশার ব্যাপারটিও রয়েছে। যারা উচ্চশিক্ষাকে সর্বৈব অথবা কিছু নয় বলে ভাবে তাদের ক্ষেত্রে এই দুর্দশা অপরিসীম। গণ বেকারী অনেক দেশে অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তুলেছে। গ্রামে ও শহরে, উন্নত ও অনুন্নত দেশে শুধুমাত্র বেকারিই নয়, মানব সম্পদের অপর্যাপ্ত ব্যবহারের প্রবণতা সম্পর্কে কমিশন সতর্ক করছে। কমিশন দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে এই কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে বেরোবার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাপ্য শিক্ষণ বিষয়গুলির ব্যাপক বিবিধকরণ। কমিশনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল সমস্ত রকমের প্রতিভার যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা এবং 'তারা বহিষ্কৃত এবং তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই'—যুবসমাজের মধ্যে অত্যধিক প্রসারিত এই ধারণাকে অপসারিত করা।

এই বিবিধ ধারণাগুলির মধ্যে থাকা উচিত বিমূর্তন এবং ধারণা গঠন সংক্রান্ত প্রথাগত শিক্ষা এবং বিদ্যালয় ও কর্ম-অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্তিত পন্থা যা শিক্ষার্থীর মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও আগ্রহ প্রদান করে। যে কোন ব্যাপারে, এই পন্থাগুলির মধ্যে এমন যোগসূত্র থাকা উচিত যাতে পন্থা নির্বাচনে প্রায়ই যে ভুল হয় তা সংশোধন করা যায়।

কমিশন আরও মনে করে শিক্ষায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ যুবসমাজকে এই আশ্বাস দেবে যে তাদের ভাগ্য ১৪ থেকে ২০ বছরের মধ্যেই চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে না।

উচ্চশিক্ষাকে অভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার উপযোগীতা

প্রথমত মনে রাখতে হবে যে অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি অন্য ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবচেয়ে যোগ্য ছাত্রদের কিছু অংশকে বাদ দিলে অন্যদের দু থেকে চার বছরের নির্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত কর্মভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ধরনের বিবিধ শিক্ষা অবশ্যই জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটায়।

গণ উচ্চশিক্ষার ওপর থেকে চাপ কমানোর জন্য উন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্ত

ক্রমবর্ধমান কঠোর নির্বাচন রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের পন্থার একটা প্রধান ত্রুটি হল বহু যুবক-যুবতী একটা স্বকৃত উপাধি পাওয়ার আগে শিক্ষা পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত থাকে; ফলে তারা প্রথাগত যোগ্যতা অর্জন বা চাকরির বাজারের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোনটাই না পেয়ে একটা বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা এমন সীমায় রাখা দরকার যার ফলে কমিশনের মূল প্রস্তাবগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন করা যায়।

উচ্চশিক্ষার বিবিধকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে ঃ—

● বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে, যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক অথবা ব্যবহারিক গবেষণা বা শিক্ষাবৃত্তির দিকে যায়।

● বৃত্তিগত যোগ্যতাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে, দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এবং বিষয়ে ক্রমাগত পরিবর্জনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতার একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে।

● সারাজীবনব্যাপী শিক্ষার প্রধান মিলনকেন্দ্র হিসাবে, পুনঃপঠনে আগ্রহী বয়স্ক লোকদের জন্য দ্বার মুক্ত করে এবং যারা নিজেদের জ্ঞান পরিবর্তন ও পরিমার্জনে আগ্রহী অথবা যারা সাংস্কৃতিক জীবনের সববিষয়ে আগ্রহী।

● আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নেতৃস্থানীয় অংশীদার হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আদানপ্রদানের সুবিধা করে দিয়ে এবং অধ্যাপকদের মাধমে যাতে সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিশ্বজুড়ে লভ্য হয়।

এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জনসেবার যুক্তি এবং কর্ম বাজারের যুক্তির মধ্যে অনিবার্য সংঘাতকে অতিক্রম করতে পারবে। এবং তারা তাদের বৌদ্ধিক এবং সামাজিক আবেদন পুনরুদ্ধার করে বিশ্বজনীন মূল্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠতে পারবে। এইগুলিকে বর্তমান কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অধিক স্বশাসনদানের যুক্তি বলে মনে করে।

এই প্রস্তাবগুলি নিরূপণ করে সেই বিষয়গুলি যাতে দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্ধারণকারী ভূমিকা রয়েছে, সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পায়। কমিশন

সে ব্যাপারে জোর দিতে চায়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের দেশের সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করা উচিত। এবং গবেষণার মাধ্যমে জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত। উন্নয়নের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব রাখাও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যা তাদের দেশকে একটা প্রকৃত উৎকৃষ্টতর ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম করবে। দারিদ্র্য ও বেকারীর জাঁতাকল থেকে তাদের দেশকে মুক্ত করতে তাদের অবশ্যই ভবিষ্যৎ নেতাদের বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ ও মধ্যস্তরের শিক্ষাদান করা উচিত। বিশেষত নিম্ন সাহারা আফ্রিকায় নতুন উন্নয়ন-আদর্শ প্রণয়ন করা দরকার যা কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে করা হয়েছে।

সঠিক সংস্কারের কৌশল:

স্বল্পমেয়াদী প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ এবং বর্তমান প্রণালীগুলির পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও, প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলির সাফল্যের জন্য কমিশন আরও দীর্ঘমেয়াদী পন্থার ওপর জোর দিতে চায়। একই সঙ্গে কমিশন একথাও জোর দিয়ে বলে যে একটার পর একটা সংস্কার এই প্রক্রিয়ার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কারণ তা প্রণালীগুলিকে ও এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলির কোনটিকেই প্রয়োজনীয় সময় দেয় না। উপরন্তু অতীত ব্যর্থতাগুলি দেখাচ্ছে যে অনেক সংস্কারক যে পথ নিয়েছেন তা হয় অতি বৈপ্লবিক অথবা অতি তাত্ত্বিক। ফলে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকেরা তা বুঝতে পারেন নি বা তা গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে অনাগ্রহী রয়ে গেছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারে অবদানকারী দলগুলি হল প্রথমে স্থানীয় গোষ্ঠী, অভিভাবক, বিদ্যালয় প্রধান ও শিক্ষকরা; দ্বিতীয়-জনঅধিকর্তারা এবং তৃতীয় আন্তজাতিক জনগোষ্ঠী। অতীতে বহু ব্যর্থতার কারণ হল এক বা একাধিক অংশীদারের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ। স্পষ্টতই ওপর থেকে বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ায় শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কারগুলি ব্যর্থ হয়েছে। যে সব দেশে এই প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সফল হয়েছে সেই সব দেশে স্থানীয় গোষ্ঠী, অভিভাবক এবং শিক্ষকরা ক্রমাগত আলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন এবং এর সঙ্গে বাইরে থেকে বিভিন্ন ধরনের

অর্থনৈতিক, কৌশলগত অথবা পেশাদারি সাহায্য পেয়েছে। এটা পরিষ্কার যে সব সংস্কারেই স্থানীয় গোষ্ঠী একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক গোষ্ঠী ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষের আলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজনগুলি নির্ণয় করা শিক্ষার উন্নতিবিধানে একটি প্রাথমিক এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। মাধ্যমগুলির সাহায্যে কথোপকথন চালিয়ে জনগোষ্ঠীতে আলোচনা এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সচেতন তৈরী করা, বিচার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যখন গোষ্ঠীগুলি নিজেদের উন্নতিবিধানে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তারা সামাজিক লক্ষ্যগুলি অর্জনের ক্ষেত্রে এবং জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষিত উন্নতিবিধানে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখে।

এদিক থেকে কমিশন একটা সাবধানী বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মূল্যকে গুরুত্ব দিতে চায় যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব এবং নতুন ধারণা প্রবর্তনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া কোন সংস্কার সফল হতে পারে না। এই কারনে কমিশন শিক্ষকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বস্তুকেন্দ্রিক অবস্থাকে অগ্রাধিকার দেবার সুপারিশ করছে।

আমরা শিক্ষকদের থেকে বলতে গেলে কিছুটা বেশিই দাবী করি যখন আমরা আশা করি যে তাঁরা অন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের যুবসমাজকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্ব আছে তাদের ব্যর্থতাগুলি পূরণ করে দেবেন। এই দাবীগুলি এমন একটা সময়ে করা হচ্ছে যখন তথ্য মাধ্যমগুলির সাহায্যে বহির্বিশ্ব বিদ্যালয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছে। কাজেই অভিভাবক এবং ধর্মীয় সাহায্য ছাড়াই আজকের যুবসমাজ অনেক বেশী জানে এবং শিক্ষকদের তাদের সঙ্গে কাজ করতে হয়। শিক্ষকরা যদি যুবসমাজের কাছ থেকে গুরুত্ব পেতে চান তবে তাঁদের এই নতুন পরিস্থিতি বুঝতে হবে। শিক্ষায় তাদের আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে। তাদের দেখাতে হবে যে তথ্য এবং জ্ঞান আলাদা এবং জ্ঞানের জন্য দরকার উদ্যোগ, মনোযোগ, শৃঙ্খলা এবং স্থির প্রতিজ্ঞা।

ভুলবশত বা যথাযোগ্য কারণেই হোক, শিক্ষকরা বিচ্ছিন্নতাবোধে ভোগেন। এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে শিক্ষকতা একটা ব্যক্তিগত কাজ। শিক্ষাপ্রসূত প্রত্যাশা

এবং বহুসময়েই অন্যায় সমালোচনার লক্ষ্যটা তাঁদের দিকে থাকাটাও একটা কারণ। সবার ওপরে শিক্ষকরা চান যে তাঁদের মর্যাদাবোধ শ্রদ্ধা পাক। বেশীরভাগ শিক্ষকই কোন না কোন সমিতির সদস্য। অনেকসময় শক্তিশালী সমিতি তাদের সংগত সুযোগ সুবিধার প্রতি যত্নবান। তা সত্ত্বেও সমাজ ও শিক্ষকদের এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক সমিতিগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা দরকার। এই আলাপ বিনিময়কে দেখতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং একে শক্তিশালী করতে হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে নতুনভাবে এ ধরনের কথাবার্তা আবার শুরু করা সহজ নয়। কিন্তু শিক্ষকদের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও হতাশ মনোভাব কাটাতে, পরিবর্তনকে গ্রহণযোগ্য করতে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তা সব থেকে জরুরি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে যোগ্য শিক্ষকদের অংশগ্রহণের সাথে সাথে উচ্চমানের শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাদানের জন্য বই, নতুন যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাতাবরণ থাকা দরকার।

আজকের বিদ্যালয়গুলির অবস্থা সম্পর্কে সচেতন বলে, কমিশন প্রথাগত শিক্ষা-উপকরণ (যথা: বইপত্র) এবং আধুনিক মাধ্যম (যথা: তথ্য) শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহৃত তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়। শিক্ষকদের দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত বিশেষত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে। যাতে প্রয়োজনীয় নমনীয়তার সাথে তাঁরা অনেক শিক্ষার্থীর ব্যর্থতা মুছে দিতে পারেন ও কিছু ছাত্রের স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে পারেন। সারাজীবনব্যাপী শিক্ষার কথা মাথায় রেখে তাঁরা শিক্ষাসংক্রান্ত এবং কর্মজীবন সংক্রান্ত আরও ভালো পথ নির্দেশ দিতে পারেন।

এই আলোকে দেখলে শিক্ষার উন্নতির জন্য নীতিপ্রণেতাদের নিজেদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে হবে। কোনও ভুলের সংশোধনের কাজ তাঁরা বাজারের ক্ষমতার ওপর অথবা কোন ধরনের স্ব-নিয়ন্ত্রণের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না।

নীতিপ্রণেতাদের গুরুত্বের প্রতি এই বিশ্বাসের জোরেই কমিশন মূল্যবোধের স্থায়িত্ব, ভবিষ্যতের দাবিসমূহ এবং শিক্ষকদের ও সমাজের কর্তব্যের প্রতি এত গুরুত্ব

দিয়েছে। যেহেতু শিক্ষা সকলের সঙ্গে যুক্ত, শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষা আমাদের প্রত্যেককে অনেক উন্নত করে সেহেতু নীতিপ্রণেতাদের এককভাবে বিতর্কমূলক আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে।

স্বাভাবিকভাই এটা আমাদের নিয়ে যায় সরকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকার দিকে। সরকারী কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে নীতি নির্বাচনে পরিষ্কার মতামত জানাতে হবে, যাতে সরকারী, বেসরকারী বা মিশ্র—যেকোন শিক্ষাই হোক না কেন, তা যেন পথ দেখাতে পারে। সেই সঙ্গে তার প্রণালীর ভিত্তিস্থাপন করেও প্রয়োজনীয় বিন্যাসের মাধ্যমে প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত সরকারী নীতিগুলিরই অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া আছে। কমিশন এই সমস্যাকে কম গুরুত্ব দেয় না। বিভিন্ন প্রণালীর জটিলতার মধ্যে না গিয়েও কমিশন মনে করে যে শিক্ষা জনগণের বিষয় এবং তা সবার প্রাপ্য হওয়া উচিত। এই নীতি গৃহীত হলে প্রতিটি দেশের ঐতিহ্য উন্নয়নের ধাপ জীবনযাপনের ধরন ও বিভাজনের পুঁজি একত্র করা যেতে পারে।

যাই হোক সমস্ত নির্বাচনই সুযোগের সমতার ভিত্তিতে করা উচিত।

আলোচনার সময়ে আমি আরও মৌলিক একটি প্রস্তাব রেখেছিলাম। যেহেতু সারাজীবনব্যাপী শিক্ষা বাস্তব হয়ে উঠেছে, সমস্ত অল্পবয়সী মানুষকেই তাদের শিক্ষার প্রারম্ভে একটা শিক্ষণ-সময় দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষা বৎসর পায়। তাদের এই অধিকার একটা প্রতিষ্ঠানের খাতে জমা করে দেওয়া হোক। এই প্রতিষ্ঠান সময়ের মূলধন সঞ্চয় করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করবে। প্রত্যেকেই যেভাবে সঠিক মনে হবে সেইভাবে তাদের আগের শিক্ষাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নিজের "সময় মূলধন" ব্যবহার করতে পারবে। কিছুটা মূলধন বয়স্কদের ক্রমিক শিক্ষা লাভ করার জন্য সরিয়ে রাখা যেতে পারে। প্রত্যেকেই তার "সময় মূলধন" ব্যাঙ্কে জমার মাধ্যমে এবং একটি শিক্ষা সংক্রান্ত সঞ্চয় কর্মসূচীর আওতায় বাড়াতে পারবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পরে কমিশন এই ধারণাটিকে সমর্থন করেছে, এমনকি সুযোগের সমতা সত্ত্বেও সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে কমিশন ওয়াকিবহাল। পঠন-সময়ের অধিকার আবশ্যিক বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্তিত সময়ে দেওয়া যেতে পারে, যাতে কিশোর বা বয়স্করা সব পথকেই

পরিত্যাগ না করে অন্তত একটা পথকে বেছে নিতে পারে।

তবে সাধারণভাবে জমতিয়েন আলোচনাসভায় প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলি পরে যদি কেউ জরুরী প্রয়োজনের কথা ভাবে সে ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব পাওয়া উচিত, কারণ লক্ষ লক্ষ বালক ও বালিকার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে ও কর্মজীবন বা উচ্চশিক্ষার সময়ের মধ্যে। এখানেই আমাদের শিক্ষণ প্রণালীর অসুবিধা শুরু হয়। তার কারণ হতে পারে যে ঐ প্রণালীগুলি বড় বেশী নির্বাচনকেন্দ্রিক এবং নিষ্ক্রিয়তা বা বিবর্তিত হবার অক্ষমতার কারণে তা গণভুক্তিকরণের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনা। এটি এমন একটা সময় যখন অল্পবয়সীরা কৈশোরের সমস্যাগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করছে যখন তারা নিজেদের পরিণত মনে করছে অথচ তারা আসলে অপরিণত যখন দুর্ভাবনাহীন হবার পরিবর্তে তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত তখন প্রয়োজন হল তাদের যথাবিহিত স্থান করে দেওয়া যাতে তারা শিখতে এবং আবিষ্কার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করা দরকার যাতে তাদের সামনের পথগুলি বন্ধ না হয়ে পাঠ ও পাঠরত অবস্থায় সংশোধনের সুযোগ থাকে।

বিশ্বজনীন গ্রামে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপ্তিকরণ: যে সব সমস্যাগুলির বিশ্বজনীন মাত্রা রয়েছে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে সবের সমাধান পাবার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের দিকে যাবার প্রবণতা কমিশন লক্ষ্য করছে। এর একমাত্র কারণ হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি প্রায়ই জোর দিয়ে বলা হয়। প্রত্যাশিত ফলাফল না পাবার জন্য কমিশন চিন্তিত এবং ফলপ্রসূ সমাধানের জন্য কমিশন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

প্রায় একই কথা সামাজিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের কথাও গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে গৃহীত নির্দেশিকাগুলির মধ্যে শিক্ষার একটা বড় ভূমিকা আছে এবং তা কমিশনকে যে সব বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলি হল:

- নারী সংক্রান্ত চতুর্থ বিশ্ব আলোচনাসভা (বেজিং, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫) থেকে

বালিকা এবং মহিলাদের শিক্ষার উৎসাহদানের জন্য নীতি সরাসরি গৃহীত হচ্ছে।

● শিক্ষার জন্য উন্নয়নমূলক সাহায্যে ন্যূনতম এক চতুর্থাংশ অর্থ বরাদ্দ করা: শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই দিক পরিবর্তন আন্তর্জাতিক তহবিলগুলিতেও হওয়া উচিত। তার প্রথম এবং প্রধানটি হল বিশ্ব ব্যাঙ্ক যা ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

● শিক্ষার জন্য ঋণদান ব্যবস্থা করা, যাতে বিন্যাস প্রক্রিয়ার এবং শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ঘাটতিগুলির প্রতিকূল ফলাফল প্রশমিত করা যায়।

● সমস্ত দেশে নতুন 'তথ্য সমাজ' প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক সূচনা যাতে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে পুনরায় ব্যবধান তৈরী না হয়।

● বেসরকারী সংস্থাগুলির অসাধারণ ক্ষমতাকে কাজে লাগানো এবং সেই উদ্দেশ্যে তৃণমূলে উদ্যোগ গ্রহণ করা যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটা মূল্যবান পটভূমিকা তৈরী হতে পারে।

এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি দেখা উচিত সাহায্যের পরিবর্তে অংশীদারিত্বের পটভূমিতে। ব্যর্থতা এবং অপচয়ের পর সংগৃহীত অভিজ্ঞতা অংশীদারিত্বের সপক্ষে মত দেয় এবং বিশ্বায়ন তা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। অবশ্য কিছু আশাব্যঞ্জক উদাহরণ আছে। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সফল অবস্থান ও আদানপ্রদানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ— ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।

অংশীদারিত্বের পক্ষে আর একটি যুক্তি হল যে তা সমস্যার সমাধান করতে পারে। শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের সফল অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি, আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য করতে পারে এবং পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে শিখতে পারে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা, শিশুদের সামাজিকীকরণের পদ্ধতি এবং সংস্কৃতি এবং জীবনের বিভিন্ন ধারাগুলি।

কমিশন এই আশা ব্যক্ত করে যে সদস্য দেশগুলি ২৮তম সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনেস্কোকে অংশীদারিত্বের আবহ তৈরী করতে এবং তা চালু করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ দেবে। ইউনেস্কো সফল পরিবর্তনগুলির প্রচার করে এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি তৃণমূলে যে উদ্যোগ নেয় তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন

করে এই কাজ সম্পন্ন করতে পারে—তা উচ্চমানের শিক্ষা তৈরী করার লক্ষ্যেই (ইউনেস্কো অধ্যাপক পদ) হোক বা অংশীদারী গবেষণা সক্রিয় করার লক্ষ্যেই হোক।

আমরা এও বিশ্বাস করি যে শিক্ষার মানের স্বার্থে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি বিধানেরও একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে।

তবে ইউনেস্কো প্রধানত শান্তি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার কাজই করবে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার মূল্য এবং যোগসূত্রের বাতাবরণের ওপর জোর দিতে হবে। তা আসবে বিশ্বপল্লীর সদস্য হিসাবে একত্র বাঁচার ইচ্ছে থেকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চিন্তার এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে।

এই প্রতিবেদনের নামকরণের জন্য কমিশন লা ফনতেনের "চাষী এবং তার ছেলেমেয়েরা" শীর্ষক নীতিকাহিনীর শরণাপন্ন হয়েছে। যেখানে কথিত আছে যে: চাষী বলল "পূর্বপুরুষেরা আমাদের জন্য যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা যাতে বিক্রি করা না হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রেখো, কারণ তার মধ্যে ঐশ্বর্য লুকানো আছে।"

কবি যেখানে কঠোর পরিশ্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সেখানে সামান্য পরিবর্তন করে পরিশ্রমের পরিবর্তে শিক্ষার সংযোজন ঘটিয়ে বলা যায় যে—

"কিন্তু বৃদ্ধ জ্ঞানী ছিল, তাই মৃত্যুর আগে বুঝিয়ে ছিল যে শিক্ষাই হল গুপ্তধন"।

জাক্ দ্যলর

কমিশনের সভাপতি

প্রথম অংশ

সূচক এবং সুপারিশ

● বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক নির্ভরতা এবং বিশ্বায়ন সমকালীন জীবনে প্রথম চালিকা শক্তি। তারা ইতিমধ্যেই সক্রিয় এবং একবিংশ শতকে গভীর ছাপ ফেলবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সামগ্রিক বিবেচনা যা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ও কাঠামো হবে।

● সমূহ বিপদ এই যে খুব কম সংখ্যক কিছু মানুষ, যারা নতুন পৃথিবীতে নিজেদের পথ খুঁজে নিতে স্বল্প সক্ষম আর বেশী সংখ্যক মানুষ যারা মনে করেছে যে তারা ঘটনার শিকার এবং সমাজের ভবিষ্যতে তাদের কোন ভূমিকা নেই—এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটা বড় ব্যবধান গড়ে উঠেছে। এই ব্যবধানে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদের এবং ব্যাপক বিদ্রোহের কারণ হতে পারে।

● আমাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে স্বীকার করতে পৃথিবীতে অধিকতর পারস্পরিক বোঝাপড়া, দায়িত্ববোধ ও ঐক্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কল্পনাকে ধারণার দ্বারা আমাদের পরিচালিত করা উচিত।

● শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির যথেষ্ট পরিমাণে বিবিধকরণ করতে হবে। এমন রূপ দিতে হবে যাতে তা সামাজিক বহিষ্কারের আর একটি অবদানকারী কারণ না হয়।

● ব্যক্তির সামাজিকীকরণের সঙ্গে ব্যক্তিগত উন্নতির সংঘর্ষ হওয়া কাম্য নয়। কাজেই একটা পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত যা সমন্বয়ের গুণগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকারগুলির প্রতি শ্রদ্ধাকে মেলাতে চেষ্টা করে।

● শিক্ষা নিজে থেকে সামাজিক বন্ধনগুলি ছিন্ন হবার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না। তবে এটা আশা করা যেতে পারে যে তা সহাবস্থানকে জোরদার করতে পারে। যা সামাজিক সঙ্গতি এবং জাতীয় পরিচিতির একটি প্রধান উপকরণ। যদি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি নিজেরা অগ্রগমন এবং সমন্বয় সাধনে অবদান না রাখতে পারে তবে বিদ্যালয়গুলি এই কাজে সফল হবে না।

● প্রত্যেক দেশের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে গণতন্ত্র এগিয়ে চলেছে বলে মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রাণবন্ততা সবসময়েই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। সচেতনতা এবং সক্রিয় নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা বিদ্যালয়ে শুরু হওয়া উচিত।

● গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ গেলে, ভাল নাগরিকত্বের একটি লক্ষণ। কিন্তু তা জোরদার হয় একটি মাধ্যমে গৃহীত নির্দেশাবলীর অভ্যাস এবং তথ্য সমাজের দ্বারা। যা প্রয়োজন তা হল স্থান নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা যাতে বিচার উপলব্ধি করার ক্ষমতা শক্তিশালী হয়।

● শিক্ষার ভূমিকা হল শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক পটভূমি তৈরী করা যাতে তারা যতদূর সম্ভব সংঘটিত পরিবর্তনগুলির অর্থ খুঁজে পায়। এটা আগেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে তারা তথ্য বাছাই করতে সক্ষম ফলত তারা ঘটনাগুলিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে পারে।

● উন্নয়নের নতুন আদর্শ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মানুষের সময় সম্পর্কিত ধারণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তনের প্রভাবের কথা মাথায় রেখে সমাজে কর্মের স্থান নিয়ে গবেষণা।

● ইউ এন ডি পি-র প্রদর্শিত পথে উন্নয়নের সমস্ত দিকগুলির ধর্তব্যের মধ্যে এনে পূর্ণতর মূল্যায়ন।

● সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি এবং উন্নয়ন নীতির মধ্যে সংযোগস্থাপন: প্রাথমিক উদ্যোগে উৎসাহদান; এবং দলবদ্ধ কর্ম স্থানীয়ভীত্তিতে বাস্তবমুখী সহযোগিতা; স্বনিযুক্তি এবং সাহসের প্রেরণা সঞ্চয়।

● বুনিয়াদি শিক্ষার প্রয়োজনীয় উন্নতি এবং প্রাপ্যতা (জমতিয়েন ঘোষণার গুরুত্ব)।

দ্বিতীয় অংশ

সূচক এবং সুপারিশ

● জীবনব্যাপী শিক্ষা চারটি স্তম্ভের ওপর অবস্থিত : জানতে শেখা, করতে শেখা, একসঙ্গে বাঁচতে শেখা এবং হতে শেখা।

● পর্যাপ্ত সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে অল্পসংখ্যক বিষয়ে গভীরভাবে কাজ করার সুযোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জানতে শেখা। শুধুমাত্র পেশাগত দক্ষতার জন্যই নয়, আরও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে কর্ম শিক্ষা হওয়া উচিত। এর দ্বারা এটাও বোঝায় যে যুবসমাজের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং কর্ম অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতেও এই ধরনের শিক্ষা সাহায্য করে। এইসব অভিজ্ঞতা প্রথাবহির্ভূত হতে পারে যা কিনা আঞ্চলিক অথবা জাতীয় প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত; আবার পাঠক্রম, বিকল্প শিক্ষা ও কর্ম এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রথাগত হতে পারে। প্রথাগত হওয়ার পরিবর্তে—তা হতে পারে স্থানীয় ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে। কারণ হিসাবে আবার তা প্রথাগতও হতে পারে—যার মধ্যে আছে পাঠক্রম, অধ্যয়ন এবং নিযুক্তি।

● অন্য মানুষের সম্পর্কে উপলব্ধি এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মর্ম উপলব্ধি করে বহুত্বের মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শান্তির বাতাবরণে সম্মিলিত কর্মযজ্ঞ সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করে একসঙ্গে বাঁচতে শেখায়।

● কিছু হতে শেখা যাতে এক জনের ব্যক্তিত্ব আরও বিকশিত হয় এবং সে আরও স্বনিয়ন্ত্রণ, বিচার বিবেচনা এবং

ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা অবশ্যই একজন ব্যক্তির কোনও ক্ষমতা যথা—স্মৃতি, যুক্তি, সৌন্দর্যবোধ, শারীরিক ক্ষমতা এবং যোগাযোগের দক্ষতাকে অস্বীকার করবে না।

● প্রথাগত শিক্ষা জ্ঞান আহরণকে গুরুত্ব দিয়ে অন্য ধরনের শিক্ষাকে বাধা দেয়। কিন্তু এখন শিক্ষাকে আরও বৃহত্তর ধারণা হিসাবে ভাবা জরুরি। বিষয়গত ও পদ্ধতিগতভাবে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতে শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার এবং নীতি তৈরি করবে।

● জীবনব্যাপী শিক্ষা একবিংশ শতকে প্রবেশের চাবিকাঠি। প্রারম্ভিক এবং ক্রমাগত শিক্ষার প্রথাগত ভেদকে তা অতিক্রম করে। এটি আর একটি প্রায়শ কথিত ধারণা যে শিক্ষণ—সমাজের সঙ্গে যুক্ত। সমাজ এই ধরনের শেখার এবং সকলের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পেতে পারে।

● নতুন আকারে ক্রমাগত শিক্ষা, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এখন যা অনুসৃত হয় অর্থাৎ শিক্ষার ক্রমিক উন্নতি, পুনঃশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ বা প্রগতির জন্য বয়স্ক শিক্ষার পাঠক্রম এসব অতিক্রম করে যায়। এর উচিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষণের দরজা খুলে দেওয়া, যথা সকলকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সুযোগ দান, জ্ঞানের ও সুন্দরের আকাঙ্ক্ষার এবং সেই সঙ্গে অতিক্রম করার প্রচেষ্টার সন্তুষ্টিবিধান অথবা বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রের প্রসার এবং গভীরতা বৃদ্ধি।

● সংক্ষেপে সারাজীবনব্যাপী শিক্ষা সমাজপ্রদত্ত সমস্ত সুযোগকে ব্যবহার করবে।

তৃতীয় অংশ

সূচক এবং সুপারিশ

● বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে সমস্ত দেশের প্রয়োজন হল বুনিয়াদি শিক্ষা জোরদার করা।

● কাজেই প্রাথমিক ও প্রথাগত মূল কার্যক্রমের পড়া, লেখা, অঙ্ক করার সাথে সাথে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতার ওপর জোর দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে একটি ভাষাতে কথোপকথন ও বোঝার ক্ষমতা অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করা চাই।

● যে প্রয়োজন আগামী দিনে আরও ব্যাপক হয়ে উঠবে তা হল বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান জগৎকে গ্রহণ করা যা একবিংশ শতকে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নতির চাবিকাঠি।

● অনুন্নত দেশগুলিতে জনগণের মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বুনিয়াদি শিক্ষার উপযোগীকরণ শুরু হবে। প্রতিদিনের জীবনের ঘটনাগুলি থেকে যা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিকীকরণকে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়।

● সাক্ষরতার কাজ এবং বয়স্কদের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষার প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে হবে।

● সমস্ত ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ সব থেকে উন্নত প্রযুক্তি প্রকৃতপক্ষে ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্পর্ক যথা জ্ঞানের প্রবাহ, কথোপকথন ও সম্মুখীন হওয়ার সাহায্যকারী ছাড়া আর কিছু নয়।

● জীবনব্যাপী শিক্ষার এই সাধারণ প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনরীক্ষণ করতে হবে। প্রধান নীতিটি হল কোন সময়েই শিক্ষা প্রণালীতে পুনরাগমনের সম্ভাবনা বন্ধ না করে বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পথের সন্ধান দেওয়া। এই নতুন নীতি যদি পুরোপুরি

প্রযুক্ত হয় তা হলে নির্বাচন এবং পথনির্দেশ সংক্রান্ত বিতর্কে তা সহায়ক হবে। তাহলে সকলেই বুঝবে যে কৈশোরে যে পথই হোক না কেন, ভবিষ্যতের কোন দরজা বা বিদ্যালয়ের দরজাও বন্ধ হবে না। সমতার সুযোগ বলতে যা বাঝায় তা সত্যি সত্যিই সার্থক হয়ে উঠবে।

● বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষা পদ্ধতির উচ্চতর স্তরের কেন্দ্র হওয়া উচিত। যদিও অনেক দেশে উচ্চতর শিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চারটি প্রধান দায়িত্ব লাভ করবে।

(১) শিক্ষার্থীদের গবেষণা এবং শিক্ষণের জন্য তৈরী করা।

(২) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চস্তরের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকা দরকার যাতে বিস্তারিত অর্থে জীবনব্যাপী শিক্ষার অনেকগুলি দিকের প্রয়োজন মেটানো যায়।

(৪) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

● সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং সমাজ তাদের কাছে যেভাবে আশা করে সেইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ন্যায় নীতিসংক্রান্ত এবং সামাজিক সমস্যাগুলির ওপর বৌদ্ধিক মতামত দিতে সক্ষম হওয়া উচিত।

● মাধ্যমিক বিদ্যালয়শিক্ষার বিভিন্নতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্ভাবনাগুলি শিক্ষাসংক্রান্ত 'একটি প্রধান রাজপথের' ধারণাকে বিলুপ্ত করে গণশিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধান করা উচিত। শিক্ষাকাল পর্যায়ক্রমে কার্যকাল পরিবর্তনের রীতির সঙ্গে এই পথগুলি বিদ্যালয়কালীন ব্যর্থতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হতে পারে। জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনে নতুন পদ্ধতির উপাধিদান অর্জিত ক্ষমতাগুলিকে স্বীকার করবে।

● শিক্ষকদের মানসিক এবং বাস্তবিক অবস্থা দেশান্তরে পৃথক। যদি জীবনব্যাপী শিক্ষাকে আমাদের সমাজের অগ্রগমন এবং মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে কমিশন নির্ধারিত কাজ সমাধা করতে হয় তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতির দরকার। শিক্ষক এবং শিক্ষিকা হিসাবে শ্রেণীকক্ষে তাদের স্থান সমাজ দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও সম্পদ দিতে হবে।

● জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা একটা

শিক্ষণ সমাজের দিকে নিয়ে যায় যা বিদ্যালয় এবং অর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানাধরনের সুযোগ দেয় এবং যেখানে প্রয়োজন হল পরিবার, শিল্প ও বাণিজ্য, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাংস্কৃতিক জীবনে কর্মরত লোকেদের আরও সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব।

● জ্ঞান ও দক্ষতার আবশ্যিক উন্নয়নের ব্যাপারেও শিক্ষকরা সচেতন। তাদের বৃত্তিগত জীবন এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাতে তারা তাঁদের পেশায় আরও যোগ্য হবার সুযোগ এমনকি নানা দায়িত্বও নিতে পারেন। এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা লাভবান হতে পারেন। এই সম্ভাবনাগুলি সাধারণত: পঠনপাঠন বা সবেতন ছুটির মাধ্যমে দেওয়া হয়। সঠিকভাবে গৃহীত এই সুবিধাগুলি সমস্ত শিক্ষকেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত।

● যেহেতু প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে নিজের দায়িত্বে এবং বৃত্তিগত কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয় তাই শিক্ষাকে একটি একক কাজ বলা যেতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও শিক্ষাদান একটি দলবদ্ধকাজ। বিশেষত: মাধ্যমিক পর্যায়ে, যাতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্রগোষ্ঠীর বা শ্রেণীর বিশেষ লক্ষ্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খাওয়াতে পারে তা দেখা দরকার।

● কমিশন বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শিক্ষক আদানপ্রদান এবং অংশীদারিত্বের গুরুত্বের ওপর জোর দিচ্ছে। বর্তমান কার্যকলাপের দ্বারা এটা প্রমাণিত যে এই ধরনের আদানপ্রাদান ও অংশীদারিত্ব শুধুমাত্র শিক্ষণের মানই নয়, উপরন্তু অন্যান্য সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণেও মূল্যবান ভূমিকা পালন করে।

● গুরুত্বপূর্ণ এইসব বিষয়গুলি আলাপ আলোচনা এমনকি শিক্ষক সংগঠনগুলির সাথে সহযোগিতা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক ধরণনকে অতিক্রম করে চুক্তির বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। তাদের সদস্যদের নৈতিক এবং বস্তুকেন্দ্রিক সুবিধাগুলি রক্ষা করা ছাড়াও সংগঠনগুলি একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তৈরী করেছে যা তারা নীতিপ্রণেতার সঙ্গে বিনিময়ে ইচ্ছুক।

● এক ধরনের শিক্ষা নির্বাচন করার অর্থ হল এক ধরনের সমাজ নির্বাচন করা। সমস্ত দেশেই এই নির্বাচনের জন্য শিক্ষা পদ্ধতিগুলির যথাযথ মূল্যায়নভিত্তিক ব্যাপক গণ আলোচনার প্রয়োজন। কমিশন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে

এধরনের আলোচনায় উৎসাহ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যাতে একটা গণতান্ত্রিক ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়। কারণ শিক্ষার সংস্কার সংক্রান্ত কৌশলগুলির সাফল্যের জন্য এটি সর্বোত্তম পথ।

● সমাজে সক্রিয় বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও প্রতিষ্ঠানকে কমিশন শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের কাজে সামিল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী। কমিশন মনে করে যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বশাসন উদ্ভাবনার উন্নয়ন এবং ব্যাপ্তিকরণে সহায়ক।

● এর জন্য কমিশন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে আবার গুরুত্ব দিতে চায়। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কর্তব্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক নির্বাচনের সংজ্ঞা প্রদান করা এবং সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করা। শিক্ষা একটি গোষ্ঠীগত সম্পদ যা শুধুমাত্র বাজারের শক্তিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

● কমিশন কোনভাবেই অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অস্বীকার করে না পরন্তু কমিশন সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বকে কাজে লাগাবার পক্ষপাতী। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বুনিয়াদি শিক্ষায় সরকারি সাহায্য একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়, কিন্তু নির্বাচনগুলি যেন সামগ্রিকভাবে পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে বিপদাপন্ন করা অথবা অন্য পর্যায়ে শিক্ষাকে বলিদান না দেয়।

● "একজন ব্যক্তির সারাজীবন ধরে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত"। এই নীতির আলোকে অনুদানের ধারণাটিকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। তাই কমিশন মনে করে যে প্রতিবেদনে সংক্ষেপে আলোচিত 'প্রস্তাবিত পঠন সময়ের অধিকার' বিষয়টিও পরীক্ষিত হবার দাবি রাখে।

● নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উচিত আগামী পৃথিবীতে জ্ঞানজগতে অবাধ প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত চিন্তনের জন্ম দেওয়া। কমিশন সুপারিশ করে:

—নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরত্বশিক্ষার উন্নয়ন ও বিবিধকরণ;

—বয়স্কশিক্ষা এবং বিশেষত কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রযুক্তির ব্যাপকতর ব্যবহার।

—উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিষেবার কাঠামো এবং ক্ষমতা শক্তিশালি করা যাতে সমাজের সর্বস্তরে ঐ প্রযুক্তি প্রসারিত হয় এবং প্রথাগত শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হল সেই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং

—ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতার নতুন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালু করা।

● আন্তজাতিক সহযোগিতা যা কিনা মূলগতভাবে পুনর্বিবেচিতহওয়া উচিত, শিক্ষাক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এটি শুধুমাত্র শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি প্রণেতা এবং শিক্ষকদেরই বিষয় নয়, যারা গোষ্ঠীজীবনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের সকলেরই বিষয়।

● বেজিং সম্মেলনের পথ ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা দরকার।

● স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং আদানপ্রদানের মাধ্যমে তথকথিত অনুদান নীতিকে অংশীদারিত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

● উন্নয়ন অনুদানের এক চতুর্থাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা উচিত।

● বিন্যাস প্রক্রিয়ার এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ঘাটতিগুলি এবং তার প্রতিকূল ফলাফলগুলি প্রশমিত করার জন্য ঋণ মকুব করার ব্যাপারটিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

● একই সমস্যাযুক্ত দেশগুলির এবং স্থানীয় পর্যায়ের মন্ত্রকের মধ্যে সহযোগিতা এবং আঁতাতকে উৎসাহ দিতে জাতীয় শিক্ষা প্রণালীকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করা উচিত।

● শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি, যথাক্রমে পাঠ্যসূচী, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তজাতিক সহযোগিতা, আন্তজাতিক মাত্রায় উন্নীত করতে দেশগুলিকে সাহায্য করা উচিত।

● শিক্ষার কাজে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির মধ্যে নতুন অংশীদারিত্বকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ জীবনব্যাপীর শিক্ষার ধারণাকে প্রসারিত এবং বাস্তবায়িত করার জন্য একটি আন্তজাতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। যা জম্‌তিয়েন সম্মেলনে গৃহীত আন্তঃসংস্থার উদ্যোগের অনুরূপ।

● মোট বেসরকারী তহবিল, শিল্প সংস্থায় লগ্নীর পরিমাণ, প্রথাগত শিক্ষায় লগ্নীর পরিমাণ ইত্যাদির নিরিখে যথোপযুক্ত সূচকের প্রতিষ্ঠার দ্বারা আন্তজাতিক স্তরে আলোচনার স্বার্থে শিক্ষার খাতে জাতীয় লগ্নীর তথ্য সংগ্রহকে উৎসাহিত করা দরকার।

● শিক্ষা প্রণালীর সব থেকে ব্যাপক ত্রুটিগুলি বোঝার জন্য বিভিন্ন সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা

করার জন্য কিছু নির্দেশিকা তৈরী করা উচিত। যেমন শিক্ষায় ব্যয়ের পরিমাণ, শিক্ষাত্যাগীদের যার সুযোগের তারতম্য, পদ্ধতির বিভিন্ন অংশের অযোগ্যতা, নিম্নমানের শিক্ষাদান, শিক্ষকদের অবস্থা ইত্যাদি।

● ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষাপ্রণালী ও সমাজে নতুন তথ্য প্রযুক্তির অনুমানযোগ্য প্রভাবের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ইউনেস্কোর একটি পরিদর্শনকেন্দ্র তৈরী হওয়া উচিত।

● ইউনেস্কোর মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক সহযোগিতাকে উৎসাহ দেওয়া দরকার। ইউনেস্কোর অধ্যাপক পদ, সহযোগী বিদ্যালয়, দেশগুলির মধ্যে সমানুপাতিক জ্ঞান বণ্টন, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং ছাত্র শিক্ষক ও গবেষক বিনিময় করা দরকার।

● সদস্য দেশগুলির পক্ষে ইউনেস্কোর কাজ যথা আন্তর্জাতিক কলাকৌশলের সঙ্গে জাতীয় আইনের সমন্বয় সাধনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

সংযোজনা

কমিশনের কার্যকলাপ :

১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কোর সাধারণ সভা তার মহাপরিচালককে একবিংশ শ.তকের শিক্ষা এবং শিক্ষণের ওপর আলোকপাত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন স্থাপন করার আমন্ত্রণ জানান। ফেডেরিকো মেয়র জাক্ দ্যলরকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বৃত্তিগত ক্ষেত্র থেকে আরও চৌদ্দজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত কমিশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

১৯৯৩ সালের শুরুতে একবিংশ শতকের উপযোগী শিক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। ইউনেস্কোর অর্থসাহায্য এবং তার দেওয়া একটি সূচীবর্গের সহায়তায় কর্মরত এই কমিশন ইউনেস্কোর মূল্যবান সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং তথ্যাদি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল। এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং সুপারিশ তৈরী করার ব্যাপারে তা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল।

এর আগে ইউনেস্কো অনেকবার বিশ্বব্যাপী শিক্ষার বিষয় এবং অগ্রাধিকারগুলির পুনরীক্ষণপূর্বক আন্তর্জাতিক সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। ১৯৬৮ সালে ইউনেস্কো'র শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (আই আই ই পি)-র তৎকালীন পরিচালক ফিলিপ এইচ কুম্বস্ "বিশ্বব্যাপী সংকট" একটি প্রণালীগত বিশ্লেষণ" প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কাজের ওপর ভিত্তি করে সুদূরপ্রসারী উদ্ভাবনের সুপারিশ করেছিলেন।

১৯৭১ সালে, পূর্ববর্তী তিন বছরের ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রেনেমাহকু(ইউনেস্কোর তৎকালীন মহাসচিব) প্রাক্তন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এডগার ফাওরেকে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি প্যানেলের সভাপতি হতে অনুরোধ করেন। প্যানেলের কাজ ছিল জ্ঞান এবং সমাজে দ্রুত পরিবর্তনের কারণে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং

শান্তির আশু প্রয়োজনে শিক্ষার নতুন লক্ষ্য স্থির। এবং স্থিরীকৃত লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য বৌদ্ধিক, মানবিক এবং আর্থিক সংস্থান নির্দিষ্ট করা। ১৯৭২ সালে 'হতে শেখা' শিরোনামে প্রকাশিত ফাউর কমিশনের প্রতিবদেনটির বিরাট কৃতিত্ব ছিল জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণাটিকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করা এমন একটি সময়ে যখন গতানুগতিক শিক্ষাপ্রণালীগুলি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

জাক্ দ্যলর-এর সভাপতিত্বে নির্মিত কমিশনটির প্রথম এবং সম্ভবত প্রধান সমস্যাটি ছিল শিক্ষাসংক্রান্ত পরিস্থিতি, ধারণা ও কাঠামোর চূড়ান্ত বৈচিত্র্য। এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রাপ্ত তথ্যের পরিমাণ যার খুব কম অংশ কমিশনের পক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই একদিকে ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং অন্যদিকে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলি কী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার কথা মনে রেখে কমিশন তথ্য নির্বাচন করতে এবং পৃথক করতে বাধ্য হয়েছে।

শিক্ষণ পদ্ধতির লক্ষণগুলির (ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয়ই) দৃষ্টিকোণ থেকে ছয় শ্রেণীর অনুসন্ধান বেছে নেওয়া হয়েছে: শিক্ষা ও সংস্কৃতি; শিক্ষা ও নাগরিকত্ব; শিক্ষা ও সামাজিক ঐক্য; শিক্ষা, কর্ম এবং নিযুক্ত; শিক্ষা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা গবেষণা ও বিজ্ঞান। এই ছয়টি শ্রেণী শিক্ষাপ্রণালীর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত আরও সরাসরি সম্পর্কিত তিনটি অনুপ্রস্থ বিষয়ের দ্বারা যথাক্রমে যোগাযোগ প্রযুক্তি; শিক্ষক এবং শিক্ষাদান এবং আর্থিক সংস্থান ও পরিচালনার দ্বারা পরিপূরিত কমিশনের গৃহীত পদ্ধতি ছিল প্রাপ্ত সময়ে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত একটি আলাপ আলোচনার পদ্ধতিতে যুক্ত হওয়া। একটি অঞ্চল অথবা কিছু দেশের বিশেষ বিবেচ্য বিষয়গুলি পরীক্ষা করার জন্য কমিশন নির্বাচিত বিষয়ে আটটি অধিবেশন ও সমসংখ্যক কার্যনিবাহী অধিবেশনের আয়োজন করেছিল। কার্যনিবহী অধিবেশনের অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের পেশার এবং সংগঠনের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, সরকারী আধিকারিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলিতে সক্রিয় ব্যক্তিবর্গ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং সরাসরি বা লেখার মাধ্যমে

ব্যক্তিগত পরামর্শে কমিশন গভীর উপকৃত হয়েছে। ইউনেস্কোর তরফ থেকে সমস্ত জাতীয় কমিশনগুলিকে দলিল এবং অপ্রকাশিত বিষয়সমূহ সরবরাহ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়েছে। খুবই আশাব্যঞ্জক উত্তরগুলিকে যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করা হয়েছে। ঠিক এইভাবে বেসরকারী সংগঠনগুলির সঙ্গেও পরামর্শ করা হয়েছে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সভাতে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গত আড়াই বছরে কমিশনের সদস্যরা ও সভাপতি বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেছেন সেই সব সভায় কমিশনের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ধারণার আদানপ্রদান হয়েছে। যাচিত অথবা অযাচিত অনেক প্রতিবেদনই কমিশনে পাঠানো হয়েছে। কমিশনের সচিবালয় প্রচুর পরিমাণে তথ্যাদি বিশ্লেষণ করেছে এবং কমিশনের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সারাংশ প্রদান করেছে। কমিশন প্রস্তাব করছে যে তার প্রতিবদেন প্রকাশ করা ছাড়াও অন্যান্য তথ্যাদিও ইউনেস্কো প্রকাশ করুক।

কমিশনের নির্দেশাবলী :

তার প্রথম সভায় (২—৪ মার্চ ১৯৯৩) কমিশন ইউনেস্কোর মহানির্দেশক দ্বারা প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত নির্দেশ পরীক্ষা করে এবং গ্রহণ করে :

একবিংশ শতকের শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক কমিশনের লক্ষ্য হল আগত বছরগুলিতে শিক্ষার সম্ভাব্য সমস্যাবলী অধ্যয়ন করা ও বিবেচনা করা এবং প্রতিবেদনের আকারে সুপারিশ সূত্রবদ্ধ করা। যা উচ্চতম পর্যায়ের আধিকারিক এবং নীতিপ্রণেতাদের কর্ম এবং নবীকরণের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়সূচী হিসেবে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলে বর্তমান বৈচিত্র্য, প্রয়োজন, উপায় এবং প্রত্যাশার কথা মনে রেখে প্রতিবেদনটি নীতি এবং বাস্তবে পরিবর্তনশীল সম্ভাব্য পথের সন্ধান দেবে প্রতিবেদনটি প্রধানত সরকারগুলির উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হবে। কিন্তু যেহেতু তার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হবে প্রধানত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সাহায্য এবং বিশেষত ইউনেস্কোর ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া ফলে তা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির পক্ষে প্রাসঙ্গিক সুপারিশগুলিও সূত্রবদ্ধ করবে।

কমিশন একটি কেন্দ্রীয় ও সার্বিক প্রশ্নের ওপরে আলোকপাত করবে : আগামী দিনে কোন ধরনের সমাজে কী ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন ? ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত চাপ ও উত্তেজনার পৃথিবীতে শিক্ষার নতুন ভূমিকা এবং শিক্ষাপ্রণালীর কাছে নতুন দাবিগুলি বিবেচনা করবে। কমিশন সমকালীন সমাজে পরিবর্তনের প্রধান প্রবণতাগুলি বিবেচনা করবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বোত্তম শিক্ষাসংক্রান্ত রীতিগুলির অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের অবস্থা কমিশন পরীক্ষা করবে। যাতে সমকালীন নীতির সামর্থ্য এবং দুর্বলতাগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। তা করার জন্য কমিশন প্রথমত কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার চেষ্টা করবে তাদের যারা শিক্ষার সঙ্গে সবথেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সব বয়সের শিক্ষার্থী, শিক্ষাকে পালন করার কাজে যুক্ত শিক্ষক, অভিভাবক গোষ্ঠীর সদস্য অথবা শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশগ্রহণকারী।

সূচনাপর্বে, কমিশনের একটি মূল প্রশ্নমালাকে চিহ্নিত করে পরীক্ষা করবে এবং সুপারিশ প্রস্তুত করবে। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে থাকবে সরকার, সমাজ, এবং শিক্ষাবিদ্‌দের চিরকালীন সমস্যার বিষয়গুলি এবং যা আগত বছরগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে সমাজের নতুন গঠন এবং শারীরিক ও সামাজিক জগতের নতুন উন্নতিগুলির দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলি। শেষের বিষয়গুলি 'নতুন অগ্রাধিকার, অনুধাবন ও কাজের ইঙ্গিত দেয়। এর মধ্যে কতগুলি অবশ্যম্ভাবী ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বিশ্বজনীন প্রতিক্রিয়া অন্যগুলি অঞ্চল বা জাতিসাপেক্ষে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করবে।

শিক্ষা এবং শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি প্রধানত দুটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যে পড়বে। প্রথম শ্রেণীটির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্যকলাপ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী। যার মধ্যে আছে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও প্রত্যেক মানুষের স্ব-পরিপূর্ণতার প্রয়োজন এবং ইচ্ছা। দ্বিতীয়টি হল শিক্ষা প্রদানকারী সম্পর্কিত বিষয়গুলি। যার মধ্যে রয়েছে আদর্শ, কাঠামো বিষয় এবং শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলির ক্রিয়াকর্ম।

কমিশন বিগত কুড়ি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় নীতি ও সংস্কারের ভবিষ্যৎবাণী ও প্রবণতাগুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করবে। এর ওপর ভিত্তি করে একবিংশ শতকের প্রাক্কালে মানব উন্নয়নের প্রধান সন্ধিক্ষণগুলি ও শিক্ষার ওপর তার গভীর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে। কমিশন আলোকপাত করবে সেই সব পথের ওপর যাতে শিক্ষা একবিংশ শতকের ব্যক্তি এবং সমাজ তৈরী করার ক্ষেত্রে আরও গতিশীল এবং সৃষ্টিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে।

নীতিসমূহ :

আলোচনায় এবং কাজে কমিশন চেষ্টা করবে সেই সমস্ত মূলগত বিশ্বজনীন নীতিগুলি মনে রাখতে যা শিক্ষাবিদ, নাগরিক, নীতিপ্রণয়নকারী শিক্ষাপ্রণালীর অন্যান্য অংশীদার এবং অংশগ্রহণকারীদের সর্বজনীন লক্ষ্য।

প্রথমত, শিক্ষা মূলত একটি মানবধিকার এবং সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ: শিক্ষণ এবং শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি এবং সমাজের উন্নতি যা এক ব্যক্তি সারাজীবন ধরে পেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রথাগত অথবা অপ্রথাগত শিক্ষার উচিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি, উন্নতি এবং প্রসারের ক্ষেত্রে সমাজের অস্ত্র হিসেবে কাজ করা এবং জ্ঞান ও শিক্ষার সর্বজনীন প্রসার।

তৃতীয়ত, সমতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং উৎকর্ষের ত্রিমুখী লক্ষ্য সব শিক্ষা নীতিগুলিতেই উপস্থিত থাকা উচিত। শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই লক্ষ্যগুলির সমন্বয়ের অনুসন্ধান। চতুর্থত, নবীকরণ ও তদনুযায়ী শিক্ষা সংস্কার গভীর এবং প্রতিটি পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী ও প্রয়োজনগুলির পরিচিতির ফল হওয়া চাই। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে যথাযথ চুক্তির মাধ্যমে এগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমত, যদিও অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈচিত্র্যের কারণে শিক্ষার বিকাশের জন্য বহুমুখী পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন, সব পথের মধ্যে সর্বসম্মত মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর বিবেচ্য বিষয়সমূহ রাষ্ট্রসংঘের পদ্ধতির

মধ্যে সাম্য থাকা দরকার। বিবেচ্য বিষয়গুলি হওয়া উচিত মানবাধিকার, সহনশীলতা ও বোঝাপড়া, গণতন্ত্র, দায়িত্ববোধ, বিশ্বজনীনতা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, শান্তির সন্ধান, পরিবেশ সংরক্ষণ জ্ঞানের আদানপ্রদান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য।

ষষ্ঠত, একথা সম্যকভাবে বিবেচনা করতে হবে যে শিক্ষার প্রসার সমগ্র সমাজের, প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের যুক্ত করা উচিৎ।

পরিধি, কার্যকলাপ এবং প্রতিবেদন :

কমিশন যে ভাবে বিষয়বস্তুর পরিধিকে দেখেছে তা একদিকে প্রাক্-বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা তৎসহ প্রথাভিত্তিক ও প্রথাবর্হিভূত শিক্ষা এবং শিক্ষা সংস্থা ও ব্যবস্থাপক সবকিছুকেই যুক্ত করে এক ব্যাপকতর শিক্ষার ধারণাকে অঙ্গীভূত করবে। অন্যদিকে, সিদ্ধান্ত ও পরামর্শগুলি প্রয়োগভিত্তিক হবে। এবং মূলত সেগুলির লক্ষ্য হবে সরকারী বেসরকারী সংস্থা এবং নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী এবং শিক্ষা নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগকারীদের অভিমুখী হবে। এটা আশা করা যায় যে এইসব সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শ ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা সংস্কার নিয়ে সুদূরপ্রসারী বির্তক ও আলোচনার ইন্ধন জোগাবে।

আলোচনায় কমিশন নির্ধারিত দু-বছর অন্তর বসবে। এবং ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে প্রতিবেদনটি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যে তা শিক্ষার নবীকরণের কর্মসূচী হিসাবে কাজে লাগবে ও আগামী বছরগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ইউনেস্কোর কার্যধারার নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ইউনেস্কোর পরিচালকমণ্ডলী এবং তার সদস্য রাষ্ট্রগুলিসহ ইউনেস্কো যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করে তাদের সবাইকে এই প্রতিবেদনটি পাঠানো হবে।

কমিশনের কাজের সাহায্যের জন্য ইউনেস্কো একটি সচিবালয়ের ব্যবস্থা করেছে এবং কমিশন তার কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ইউনেস্কোর বৌদ্ধিক এবং পার্থিব সম্পদকে প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুরু থেকেই ড্যানিয়েল ব্লনডেল কমিশনের কাজের ধারাকে তাৎপর্যপূর্ণ প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। গবেষণা, অধ্যয়ন এবং বর্তমান প্রতিবেদনের অনেকগুলি অধ্যায়ের রূপরেখা তৈরির মাধ্যমে তিনি কমিশনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

বিশিষ্ট উপদেষ্টামণ্ডলী :

কমিশনকে এমন একদল প্রথিতযশা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সাহায্য করেছে যাদের শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তাশীল অবদান আছে। এই সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সভ্যদেরকে কমিশন নানাভাবে (যথা লিখিত বিবৃতি দাখিল, সভাগুলিতে উপস্থিত থাকা) অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নিচে এই সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যক্তিবর্গ :

জোরগে এ্যালেন্‌ডে

চিলিজাত জেবরসায়ণবিদ ও আণুবিক জীব বিজ্ঞানী; ইউনিভার্সিটি অব চিলির অধ্যাপক; ফেলো অব্ দি থার্ডওয়ার্ল্ড একাডেমি অব্ সায়েন্স; চিলিয়ান একাডেমি অব্ সায়েন্সের সদস্য।

এমেকা আনায়োকু

নাইজিরিও কূটনীতিক; কমন্‌ওয়েলথ সচিবালয়ের মহাসচিব।

মার্গারিটা মারিলে দ্য বোতেরো : কলেজিও ভারদে, ভিলা দ্য লেইভার কার্যনির্বাহী অধিকর্তা। কলামবিয়ার ন্যাশনাল্ ইনস্টিটিউট অব ন্যাচারাল রিসোর্স এ্যান্ড দি এনভায়রনমেন্টের ভূতপূর্ব মহা-অধিকর্তা।

গ্রো হারলেম ব্রান্টল্যান্ড

নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী; ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্টের সভাপতিত্ব করেছিলেন।

এলিজাবেথ ডাওডেস্‌ওয়েল্

কার্যনির্বাহী অধিকর্তা, ইউনাইটেড্ নেশনস এন্‌ভায়রনমেন্টাল্ প্রগ্রাম' (ইউ এন,

ই পি), নাইরোবি।

ড্যানিয়েল গয়্যুদেভার্ট

ফ্রেন্ড বিস্‌নেস্ এক্সিকিউটিভ; প্রিমিয়ার ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, গ্রিনক্রস্ ইন্টার ন্যাশনাল; ভোক্স ওয়াগন ম্যানেজমেন্ট বডির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান; ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপ ইনিশিয়েটিভের (আই পি আই) পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য।

মাকামিনান মাকাগিয়ানসার

ভূতপূর্ব ইউনেস্কো এ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর জেনারেল ফর কালচার; ইন্দোনেশিয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের উপদেষ্টা।

ইহুদি মেনুহিন

ব্রিটিশ বেহালাবাদক; রয়্যাল ফিল্‌হারমোনিক অর্কেস্ট্রার প্রেসিডেন্ট ও এ্যাসোসিয়েট কনডাক্টর; শান্তি ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৭০ সালের নেহরু পুরস্কার প্রাপক; এ্যাকাডেমি ইউনিভার্সালে দ্য লা কালচারের সদস্য।

থমাস্ ওধিয়াম্বো

কেনিয়াজাত বিজ্ঞানী; আফ্রিকান এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভাপতি; ইন্টার ন্যাশানাল কাউন্সিল অব সায়েন্টি ফিক্ ইউনিয়নসের সদস্য।

রেনে রেমন্ড

ফরাসী ঐতিহাসিক; ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অব পলিটিক্যাল সায়েন্সের সভাপতি; রেভ্যু হিস্টোরিকের সহ-অধিকর্তা।

বার্টান্ড স্কোয়ার্তজ

ফরাসী বাস্তুকার, শিক্ষাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; কাউন্সেল ইকনমিক্ এট্ সোস্যাল-এর সদস্য।

আনাতোলি সব্‌চাক্

রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্তর্গত সেন্ট পিটাসবুর্গের মেয়র, সেন্ট পিটাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির বিভাগীয় প্রধান ও ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী।

ডেভিড্ সুজুকি

কানাডিয়ান বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ্ ও আন্তজাতিক বক্তা এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত সিনেমা ও দূরদর্শন অনুষ্ঠানসূচির মডারেটার; বিজ্ঞান এবং বেতার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিবিধ পুরস্কার প্রাপ্ত।

আহমেদ জাকি জামানি

আইনজ্ঞ, সৌদি আরবের পেট্রোলিয়াম ও খনি দপ্তরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী, মহাসচিব ও সভাপতি, অর্গানাইজেশ্ন অব আরব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিস।

প্রতিষ্ঠানসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটিজ (আই এ ইউ)

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডাল্ট এডুকেশন্ (আই সি এ ই)

এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল (ই আই)

ইউনাইটেড নেশন্স ইউনিভার্সিটি (ইউ এন ইউ)।